জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১৫

ISSN 2222-5188

ইনফো

মেডিকাস

চিকিৎসা সাময়িকী

৪র্থ পর্ব, ৩য় সংখ্যা

- বিশেষ প্রবন্ধ
- জরুরী চিকিৎসা
- রোগ ও চিকিৎসা
- স্বাস্থ্যকথা

সূচী

বিশেষ প্রবন্ধ	৩
ছবি দেখে রোগ নির্ণয়	৬
চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য	৭
জরুরী চিকিৎসা	৮
রোগ ও জিজ্ঞাসা	১০
রোগ ও চিকিৎসা	১১
ইনফো কুইজ	১৪
স্বাস্থ্যকথা	১৫

সম্পাদক মণ্ডলী

এম মহিবুজ জামান
ডাঃ এস. এম. সাইদুর রহমান
ডাঃ তারেক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম
ডাঃ তারেক-আল-হোসাইন
ডাঃ আদনান রহমান
ডাঃ ফজলে রাব্বি চৌধুরী
ডাঃ শায়লা শারমিন

প্রকাশনায়

মেডিকেল সার্ভিসেস্ ডিপার্টমেন্ট
এসিআই লিমিটেড
নভো টাওয়ার, ১০ম তলা
২৭০ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা-১২০৮

ডিজাইন

ক্রিয়েটিভ কমিউনিকেশন লিঃ
রোড # ১২৩, বাড়ী # ১৮এ
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২

সম্পাদকীয়

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ,

ইনফো মেডিকাস এর চতুর্থ পর্ব, তৃতীয় সংখ্যা আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমাদের সাথে থাকার জন্য শুরুতেই এসিআই পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই অশেষ ধন্যবাদ। এই চিকিৎসা সাময়িকীর অন্যতম উদ্দেশ্য হল চিকিৎসা বিজ্ঞানের কিছু রোগ সম্পর্কে আলোচনা ও যুগোপযোগী কিছু তথ্য আপনাদের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে আপনাদের জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করা।

এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে এই সংখ্যার বিশেষ প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করেছি 'ধনুষ্টংকার'। এই রোগের ফলে আমাদের দেশে প্রতি বছর গড়ে ২০-২৫ হাজার রোগী মারা যায়। তাই এ রোগ নির্ণয় ও তার যথাযথ চিকিৎসা এবং সঠিক টিকার ডোজ সম্পর্কে জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই কথা বিবেচনা করে টিকার ডোজ নিয়ে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করেছি। পাশাপাশি বিশেষ প্রবন্ধে আমরা আরও আলোচনা করেছি 'ডিজমেনোরিয়া' বা ঋতুকালীন ব্যথা নিয়ে যা কম বেশী সকল নারীর ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। তাই এ রোগের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, যা আপনাদের দৈনন্দিন চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

'ছবি দেখে রোগ নির্ণয়' বিভাগটিতে প্রতিবারের মতো এবারও আমরা বেশ কিছু ছবি উপস্থাপন করেছি আপনাদের সামনে, যার মাধ্যমে আশা করি আপনারা কিছুটা হলেও উপকৃত হবেন।

পাশাপাশি 'চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য' বিভাগে আলোচিত হয়েছে যুগোপযোগী ও আধুনিক কিছু তথ্য, যেমন সাম্প্রতিক কালে বিজ্ঞানীরা ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার শনাক্তকরণে নতুন এক পরীক্ষা পদ্ধতি বের করেছেন, যার ফলে শুধু একটি রক্ত পরীক্ষাতেই ধরা পড়বে ক্যান্সার। তাদের মতে, প্রচলিত পদ্ধতিগুলোর চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ কার্যকর হবে এটি। এছাড়াও বিজ্ঞানীরা এমন এক অণুজীব নিয়ে কাজ করেছেন যেগুলো শরীরের অসুখ বিসুখ তুলনামূলক কম সময়েই শনাক্ত করতে পারবে। তাই এই বিভাগে আমরা 'স্মার্ট অণুজীব' নিয়ে আলোচনা করেছি।

'জরুরী চিকিৎসা' বিভাগে আলোচিত হয়েছে দুইটি বিষয় নিয়ে 'ফিজিওথেরাপী' ও 'মাথায় আঘাত'। ফিজিওথেরাপী আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক অন্যতম এবং অপরিহার্য শাখা। তাই এর সম্পর্কে আপনাদের সাধারণ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। মানবদেহের একেবারে উপরে যেহেতু মাথার অবস্থান, তাই মাথায় আঘাত লাগতেই পারে। আর সেক্ষেত্রে কী কী করণীয়, এর ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'মাথায় আঘাত' বিষয়টিতে।

এছাড়া 'রোগ ও চিকিৎসা' বিভাগে বাংলাদেশের অতি পরিচিত কিছু রোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যার মধ্যে আছে 'খোসপাঁচড়া', 'শিশুর জ্বর' এবং 'শিশুর জ্বর ও খিঁচুনি'।

পরিশেষে এই প্রত্যাশা করছি যে, আপনাদের সাথে আমাদের এই বন্ধন ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছান্তে,

(ডাঃ এস. এম. সাইদুর রহমান)
মেডিকেল সার্ভিসেস্ ম্যানেজার

ধনুষ্টংকার

ধনুষ্টংকার বা টিটেনাস একটি ঘাতক ব্যাধি। এ রোগে আক্রান্ত অধিকাংশ রোগীই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

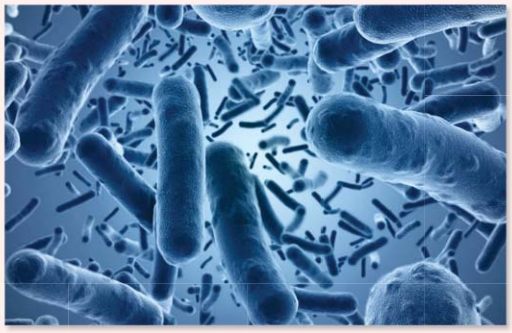

আমাদের দেশে প্রতিবছর গড়ে বিশ থেকে পঁচিশ হাজার লোক শুধু এ রোগী আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। মূলত অজ্ঞতা এ রোগের জন্য দায়ী। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সাধারণত শতকরা আশি থেকে নব্বই জনই উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে এবং ভুল চিকিৎসার কারণে প্রাণ হারায়। তবে এ রোগ সঠিক সময়ে ধরা পড়লে এবং উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, এই রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

কারণ

সাধারণত যেসব কারণে এ রোগ হয় সেগুলো হচ্ছে-

- শরীরের কোন স্থান কেটে গেলে ঐ স্থানে সামান্য ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং সেখানে যদি ক্লষ্ট্রিডিয়াম টিটানী *(Clostridium tetani)* নামক জীবাণু বাসা বাধে, তখন ক্ষতস্থান থেকে টিটেনোস্পাজমিন নামক এক প্রকার টক্সিন সৃষ্টি হয় যা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে ধনুষ্টংকার রোগ সৃষ্টি হয়
- সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে বা গর্ভপাত হওয়ার ফলে মাও এ ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে

- শিশুর নাড়ি কাটার সময় পুরাতন ব্লেড কিংবা চাকু দিয়ে নাড়ি কাটার ফলেও এ রোগে মা ও শিশু উভয়েই আক্রান্ত হতে পারে
- আবার পায়ের ভিতর পেরেক ঢোকার ফলে কিংবা অপারেশনের পরে রোগী এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে

সুপ্তকাল

ধনুষ্টংকার রোগের জীবাণু ক্লষ্ট্রিডিয়াম এর টিটানী *(Clostridium tetani)* সুপ্তকাল ৩ থেকে ২১ দিন।

লক্ষণসমূহ

এই রোগের লক্ষণসমূহ নিচে বর্ণনা করা হল-

প্রাথমিক অবস্থায়

- ঢোক গিলতে কষ্ট হওয়া
- প্রথম অবস্থায় চোয়াল লেগে যাবে, মুখ খোলা যাবে না। এই অবস্থাকে বলে লক-জ (Lock jaw)
- ঘাড়ে, পিঠে এবং পেটে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হবে
- ক্ষতস্থানে ব্যথা হবে
- রোগীর ঘাড় শক্ত হয়ে যাবে
- ধীরে ধীরে হাত পায়ের মাংসপেশী এবং সমস্ত শরীরের মাংসপেশী শক্ত হয়ে যাবে
- রোগীর খিঁচুনি শুরু হবে এবং ঘাড় পিছনের দিকে ধনুকের মতো বেঁকে যাবে
- খিঁচুনির পর বিরতি দিয়ে আবার খিঁচুনি হবে
- খিঁচুনির সময় রোগী গোঙাতে থাকে, রোগ যত কঠিনের দিকে যায় ততই রোগীর ঘন ঘন খিঁচুনি হয়
- কপালে মাংসপেশী কুঁচকিয়ে যায়, নাড়ির গতি স্বাভাবিক থাকে কিংবা বৃদ্ধি পায়

২৪ থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে যদি চিকিৎসা করা না হয়

- শ্বাসনালীর মাংসপেশী শক্ত হয়ে যাবে, যার ফলে রোগীর শ্বাস নিতে কষ্ট হবে এবং রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে

পরীক্ষা

এই রোগ শারীরিক পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়। তবে ক্ষতস্থান থেকে জীবাণু নিয়ে এই রোগ সনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব।

চিকিৎসা

- আক্রান্ত রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করে এমন স্থানে রাখতে হবে, যেখানে আলো ও শব্দ কম থাকে
- পানি শুন্যতা প্রতিরোধ করতে হবে
- পর্যাপ্ত পুষ্টি প্রদান করতে হবে

পরিষ্কার ক্ষতের ক্ষেত্রে

যদি আগে টিকা দেয়া না থাকে

- Inj. Tetanus Toxoid (TT) - প্রথম ডোজ ক্ষত হওয়ার সাথে সাথে নিতে হবে
- Inj. Tetanus Toxoid (TT) - দ্বিতীয় ডোজ, প্রথম ডোজের দেড় মাস পর নিতে হবে

- Inj. Tetanus Toxoid (TT) - তৃতীয় ডোজ, প্রথম ডোজের তিন মাস পর নিতে হবে
- Inj. Tetanus Toxoid (TT) - বুস্টার ডোজ, প্রতি ৫ বছর পর পর নিতে হবে

যদি আগে টিকা দেয়া থাকে, কিন্তু ৫ বছরের মধ্যে বুস্টার ডোজ দেয়া না থাকে

- সেক্ষেত্রে Inj. Tetanus Toxoid (TT) এর একটি ডোজই যথেষ্ট

অপরিষ্কার ক্ষতের ক্ষেত্রে

- Inj. Tetanus Toxoid (TT) - প্রথম ডোজ ক্ষত হওয়ার সাথে সাথে নিতে হবে
- Inj. Tetanus Toxoid (TT) - দ্বিতীয় ডোজ, প্রথম ডোজের এক মাস পর নিতে হবে
- Inj. Tetanus Toxoid (TT) - তৃতীয় ডোজ, প্রথম ডোজের দুই মাস পর নিতে হবে
- Inj. Tetanus Toxoid (TT) - চতুর্থ ডোজ, প্রথম ডোজের ছয় মাস পর নিতে হবে
- Inj. Tetanus Immunoglobulin (TIG) - একটি ডোজ ক্ষত হওয়ার সাথে সাথে নিতে হবে
- Inj. C-Penicillin, প্রতি ৬ ঘণ্টা পর পর, ৫ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত নিতে হবে

টিটেনাসের টিকা

০ থেকে ১১ মাস এবং ১৫ মাস বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে

- টিকার নাম - পেন্টাভ্যালেন্ট
- ডোজের পরিমাণ - ০.৫ মিঃলিঃ
- ডোজের সংখ্যা - ৩ টি
- ডোজের মধ্যে বিরতি - ৪ সপ্তাহ
- টিকা শুরু করার সঠিক বয়স - ৬ সপ্তাহ
- টিকাদানের স্থান - উরুর মধ্যভাগের বহিরাংশে
- টিকার প্রয়োগ পথ - মাংসপেশিতে

১৫ বছর বয়সী কিশোরী ও ১৫-৪৯ বছর বয়সের মহিলাদের ক্ষেত্রে

- টিকার নাম - টিটি (টিটেনাস টক্সোয়েড)
- ডোজের পরিমাণ - ০.৫ মিঃলিঃ
- ডোজের সংখ্যা - ৫ টি
- টিকাদানের স্থান - বাহুর উপরের অংশে (ডেলটয়েড মাসল)
- টিকার প্রয়োগ পথ - মাংসপেশিতে
- টিকা শুরু করার সঠিক বয়স -
  - টিটি ১ - ১৫ বছর বয়সে
  - টিটি ২ - টিটি ১ পাওয়ার কমপক্ষে ২৮ দিন পর
  - টিটি ৩ - টিটি ২ পাওয়ার কমপক্ষে ৬ মাস পর

  - টিটি ৪ - টিটি ৩ পাওয়ার কমপক্ষে ১ বছর পর
  - টিটি ৫ - টিটি ৪ পাওয়ার কমপক্ষে ১ বছর পর

গর্ভবতী মায়ের ক্ষেত্রে

- যদি পূর্বে টিটি টিকার ১-৪ টি ডোজ দেয়া থাকে, সেক্ষেত্রে প্রসবের পূর্বে একটি টিটি টিকার ডোজ যথেষ্ট
- যদি পূর্বে টিকা দেয়া না থাকে অথবা টিটি টিকার সঠিক সংখ্যা জানা না থাকে সেক্ষেত্রে প্রসবের পূর্বে এক মাসের ব্যবধানে দুইটি টিটি ডোজ দেয়ার পর পরবর্তী ডোজগুলো হবে-
  - তৃতীয় ডোজ - দ্বিতীয় ডোজের ছয় মাস পর
  - চতুর্থ ডোজ - তৃতীয় ডোজের এক বছর পর
  - পঞ্চম ডোজ - চতুর্থ ডোজের এক বছর পর

ডিজমেনোরিয়া - ঋতুকালীন ব্যথা

ঋতুস্রাব বা মাসিকের সময় তলপেটে কোনো ব্যথা বা কষ্টদায়ক অনুভূতি হয় না, এমন নারীর সংখ্যা কম। পরিমাণগত দিক দিয়ে এ ব্যথা সামান্য থেকে তীব্র যেকোনো মাত্রায় হতে পারে। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় এ ব্যথার পরিমান যখন এমন হয় যে তা দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত করে, তখনই কেবল এটাকে অসুস্থতা বা ডিজমেনোরিয়া বলে গণ্য করা হয়।

কারণ

- বয়ঃসন্ধিকালের মেয়েদের অত্যাধিক মানসিক চাপ ও চাঞ্চল্য
- দুশ্চিন্তা
- জরায়ুর অস্বাভাবিক গঠন
- জরায়ুর পেশীর প্রবল সংকোচন
- দূর্বল শারীরিক গঠন
- শারীরিক ও মানসিক অবসাদ
- পিরিয়ডের সময় জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে অতিরিক্ত পরিমান প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন হরমোন নিঃসরণ

লক্ষণ

- পিরিয়ড শুরুর কয়েক ঘন্টা আগে বা শুরুর সময় ব্যথা হয় এবং তা ২-৩ ঘন্টা থেকে আরম্ভ করে ২৪ ঘন্টার মতো থাকতে পারে
- এই ব্যথা তলপেট ও কোমর থেকে দুই উরুর উপরের অংশে প্রসারিত হয়
- কখনও বমি বমি ভাব বা বমি হয়
- ক্লান্তি, ডায়রিয়া, মাথাধরা থাকতে পারে
- এমনকি অজ্ঞান পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে

প্রকারভেদ

ডিজমেনোরিয়া দুই ধরনের-

- প্রাইমারি ডিজমেনোরিয়া
- সেকেন্ডারি ডিজমেনোরিয়া

প্রাইমারি ডিজমেনোরিয়া

সাধারণত ১৮ থেকে ২৪ বছরের তরুণীরা এতে বেশি ভোগেন। এর নির্দিষ্ট কোনো কারণ জানা নেই, তবু কারণ হিসেবে কিছু বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে। যেমন, মাসিকের সময় ব্যথার প্রতি সংবেদনশীলতা বেড়ে যাওয়া, ঘরে বাইরে অশান্তি, পরীক্ষার চাপ, বেকারত্ব, ভগ্নস্বাস্থ্য ইত্যাদি। এ ছাড়া গবেষণায় কিছু হরমোনের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে, যেমন - প্রোজেস্টেরন, প্রোস্টাগ্লান্ডিন, ভেসোপ্রেসিন ইত্যাদি। আরেকটি চমকপ্রদ তথ্য হলো, অন্তত একবার গর্ভধারণ এবং স্বাভাবিক প্রসবের পর এ সমস্যাটি আপনা আপনি সেরে যায়। গর্ভধারণ ও প্রসবের মাধ্যমে জরায়ু পরিপক্বতা লাভ করে এবং সাধারণত এরপর ডিজমেনোরিয়া হয় না। মাসিক শুরুর সঙ্গে এ ব্যথা শুরু হয় এবং প্রথম দিনের পর আর ব্যথা থাকে না। তলপেটে মোচড়ানো ধরনের ব্যথা হয়। কোমরে ব্যথা হতে পারে। উরু বা থাইয়ের ভেতরের অংশেও ব্যথা হতে পারে। এ ব্যথা কখনো উরুর পেছনে বা হাঁটুর নিচে যায় না। এ সময় ব্যথার প্রভাবে রোগীকে বিমর্ষ দেখায়। তার বমি ভাব অথবা বমি হতে পারে; ডায়রিয়া কিংবা প্রস্রাবেও ব্যথা হতে পারে।

প্রতিকার

কিশোরী বয়সে মাসিক সম্পর্কে কিছু ধারণা দেওয়া জরুরী। এ ক্ষেত্রে মা, বড় বোন কিংবা অন্য নিকট আত্মীয়ের দায়িত্ব অনেক। বিষয়টি সেকেন্ডারি স্কুলপর্যায়ে পাঠ্য রয়েছে ঠিকই, তবে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষিকার খোলামেলা বৈজ্ঞানিক আলোচনা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক তথ্য জানা থাকলে ভীতি কমবে। ভীতি কমলে ব্যথার তীব্রতা কম অনুভূত হবে। এ ছাড়া নিয়মিত ব্যায়াম, ভগ্নস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, অশান্তির সঠিক সমাধান ইত্যাদি বিষয়ও আমলে আনতে হবে।

চিকিৎসা

বাজারে যেসব ব্যথানাশক (এনএসএআইডি) ওষুধ পাওয়া যায়, তার সবই শরীরে প্রোস্টাগ্লান্ডিন উৎপাদন কমায় এবং ডিজমেনোরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর। তবে গাইনি ডাক্তারদের প্রথম পছন্দ মেফেনামিক এসিড ট্যাবলেট। আজকাল ল্যাপারোস্কোপির মাধ্যমেও এ রোগের বিবিধ চিকিৎসা রয়েছে।

সেকেন্ডারি ডিজমেনোরিয়া

অনেক গাইনি রোগের কারণে মাসিকের সময় ব্যথা হতে পারে, যেমন তলপেটের ইনফেকশন, জরায়ুর টিউমার, পলিপ, জন্মগত ত্রুটি, এন্ডোমেট্রিয়োসিস ইত্যাদি। বিবিধ কারণ থাকায় মাসিকের সময় ব্যথার ধরণও ভিন্ন হয়ে থাকে। সাধারণত মাসিক চক্রের শেষ সপ্তাহে তলপেটে ভার ভার অনুভূত হয়। মাসিক শুরুর তিন চার দিন আগে থেকেই ব্যথা হয়। মাসিক শুরু হলে ব্যথা কমতে থাকে। সেকেন্ডারি ডিজমেনোরিয়ার জন্য আলাদা কোনো চিকিৎসা নেই। প্রথমে অন্তর্নিহিত রোগটি সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হবে।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

ছবি দেখে রোগ নির্ণয়

পেরি অকুলার পারপুরা

বগলের টিউমার

কিউটেনিয়াস পাসটিউল

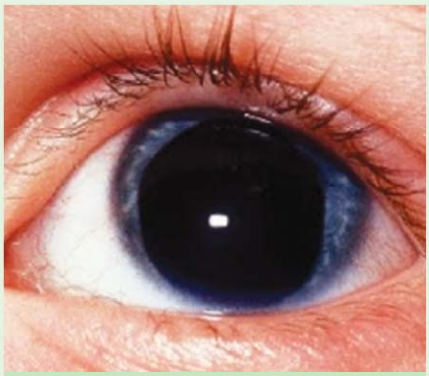

ফটোফোবিয়া

মুখের নডিউল

পেরি ওরাল র‍্যাশ

হারপিস সিমপ্লেক্স প্রদাহ

মুখের আলসার

ওরাল মিউকোসাইটস

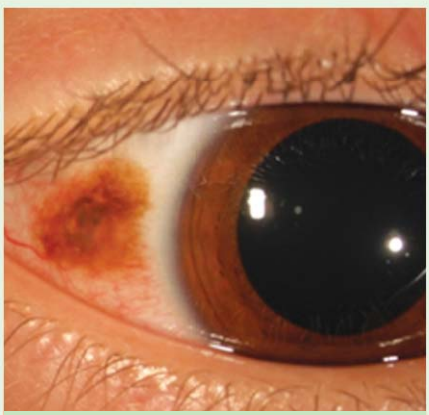

চোখের টিউমার

ওরাল প্যাপিউলোনডিউলার লিসন

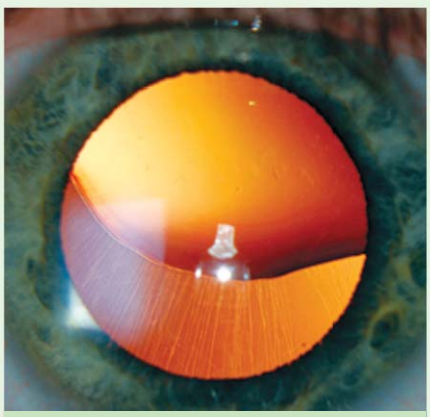

একটপিক লেনটিস

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

শুধু রক্ত পরীক্ষায় শনাক্ত হবে ডিম্বাশয়ের ক্যানসার

ডিম্বাশয়ের ক্যানসার আছে কি না, জানার জন্য সাধারণ একটি রক্ত পরীক্ষাই যথেষ্ট। যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের (ইউসিএল) একদল বিজ্ঞানী রোগটি শনাক্ত করার নতুন এ পদ্ধতি বের করেছেন। তাঁদের মতে, ডিম্বাশয়ের ক্যানসার নির্ণয়ের প্রচলিত পদ্ধতিগুলোর চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ কার্যকর এটি। রক্ত পরীক্ষার এই নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করে ডিম্বাশয়ের ক্যানসারের ৮৬ শতাংশই শনাক্ত করা যাবে। পরীক্ষামূলক এক গবেষণার ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা এ কথা জানিয়েছেন। জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল অনকোলজি সাময়িকীতে এ গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ডিম্বাশয়ের ক্যানসার শনাক্ত করতে বিলম্বের কারণে প্রায়ই তা প্রাণঘাতী রূপ নেয়। ইউসিএলের গবেষকেরা কমপক্ষে ৪৬ হাজার নারীর ওপর ১৪ বছরব্যাপী রক্ত পরীক্ষার নতুন পদ্ধতিটি প্রয়োগ করে দেখতে পান, এটি প্রাথমিক পর্যায়েই ডিম্বাশয়ের ক্যানসার শনাক্ত করতে পারে। যুক্তরাজ্যে প্রতিবছর প্রায় ৭ হাজার ১০০ নারীর ডিম্বাশয়ে ক্যানসার ধরা পড়ে এবং সেখানে এ রোগে বছরে প্রায় ৪ হাজার ২০০ জনের মৃত্যু হয়। এ ক্যানসারের উপসর্গ হলো পেটব্যথা, পেট ফুলে যাওয়া এবং খেতে সমস্যা ইত্যাদি। এসব দেখে রোগটি শনাক্ত করা কঠিন।

ডিম্বাশয়ের ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীদের বমির সঙ্গে সিএওয়ানটুফাইভ (CA-125) নামের একটি রাসায়নিক পদার্থ প্রচুর পরিমাণে বেরিয়ে আসে। এটিকে রোগটির একটি লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যুক্তরাজ্যে রোগটি নির্ণয়কারী একদল গবেষক মেনোপজ পরবর্তী নারীদের ওপর পরীক্ষা চালান। তাঁরা সিএওয়ানটুফাইভের (CA-125) মাত্রা পরিবর্তনের ব্যাপারটি যাচাই করেন। এ পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা ৮৬ শতাংশ ক্যানসার রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমেই শনাক্ত করতে সমর্থ হন। এই পদ্ধতিতে রক্ত পরীক্ষার পাশাপাশি আলট্রাসাউন্ড স্ক্যানও ব্যবহার করা হবে। বিজ্ঞানীরা তাই নতুন এ পদ্ধতিকে ডিম্বাশয়ের ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এক বড় অগ্রগতি হিসেবে বিবেচনা করছেন।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

স্মার্ট অণুজীবে রোগ নিরাময়!

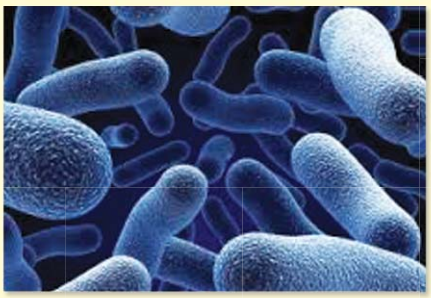

ব্যাকটেরিয়া বা অণুজীবগুলো জিনপ্রকৌশলের মাধ্যমে রূপান্তর করা যায়। বিজ্ঞানীরা এমন অণুজীবকে বলছেন, স্মার্ট অণুজীব। এই অণুজীবগুলো শরীরের অসুখ বিসুখ তুলনামূলক কম সময়ে শনাক্ত করবে এবং সারিয়ে তুলবে।

এ প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম উপায়ে বিভিন্ন জীবসত্তা সৃষ্টি এবং পুনর্গঠনের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীরা এখন চেষ্টা করছেন ব্যাকটেরিয়া কোষগুলোকে অর্ধপরিবাহী সিলিকন পাতের সমতুল্য জৈব উপাদানে রূপ দেওয়ার। জৈব জ্বালানি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ইতিমধ্যে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। আর আমাদের শরীরে বসবাসকারী অণুজীবগুলোর ওপর একই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে স্বাস্থ্য বা চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন আনার সুযোগ রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন।

কী কী খাদ্য উপাদান আছে, কোন কোন রোগ ঘাপটি মেরে আছে, কেমন প্রদাহ হতে পারে ইত্যাদি ব্যাপার মানবদেহে অবস্থানকারী অণুজীবগুলো খুব ভালো টের পায়। এ রকম ব্যাকটেরিয়ার জীবনচক্র নিয়ে গবেষণাগারে প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে দেখা যায়, এদের মধ্যে শতাধিক জিনগত পরিক্রমা রয়েছে এবং সেগুলো শরীরের বিভিন্ন লক্ষণ বা উপসর্গে ভিন্ন ভিন্ন সাড়া দিতে পারে। যেমন কোনো খাবারে ক্ষতিকর উপাদান থাকলে সেটি খাওয়ার পর নির্দিষ্ট অণুজীবটি সঙ্গে সঙ্গে টের পায় এবং সাড়া দেয়। বিজ্ঞানীরা এ রকম প্রতিটি পরিক্রমা নতুন করে এমনভাবে সাজাতে চান যেন পরিবেশগত সূত্র অনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়। তাঁদের প্রাথমিক পরীক্ষাগুলোয় একটি ডিএনএ স্মৃতি নির্ণায়ক যন্ত্র তৈরির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, যার মাধ্যমে মানবদেহের ভেতরে ব্যাকটেরিয়ার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ধারণ করা যায়। ব্যাকটেরিয়া যা যা শনাক্ত করতে পারে, সেগুলোর সঙ্গে মিল রেখে ডিএনএ স্মৃতি নির্ণায়ক যন্ত্রটির কাঠামো তৈরি করা হয়। এ ক্ষেত্রে দ্বিমিক (বাইনারি) কম্পিউটার বিটের মাধ্যমে তথ্য ধারণের প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। শরীরে প্রদাহ নিবারণকারী কিছু অণু থাকে এবং সেগুলো ব্যাকটেরিয়াই লুকিয়ে রাখে। গবেষকেরা সেগুলোর নকশা তৈরির লক্ষ্যে কাজ করছেন, যাতে করে ব্যথা নিরাময়ের জন্য অন্ত্রের ভেতরে প্রয়োগ করা কোনো ওষুধের কার্যকারিতা ওই ব্যথা সেরে যাওয়ার পরপরই বন্ধ করে দেওয়া যায়। এভাবে এসব স্মার্ট ব্যাকটেরিয়া মানবদেহে আক্রমণকারী রোগজীবাণু প্রতিরোধে সহায়ক হতে পারে। এমনকি একই উপায়ে ক্যানসারের মতো রোগ শুরুতেই শনাক্ত করে সারিয়ে তোলার সুযোগ তৈরি হবে। পাশাপাশি দূর করা যাবে ডায়রিয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো রোগ।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

ফিজিওথেরাপি

ফিজিও মানে শারীরিক এবং থেরাপি মানে চিকিৎসা । এই শব্দ দুটি মিলে ফিজিওথেরাপি বা শারীরিক চিকিৎসার সৃষ্টি। ফিজিওথেরাপি আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক অন্যতম এবং অপরিহার্য শাখা। একজন ফিজিওথেরাপি চিকিৎসক স্বাধীন এবং স্বতন্ত্রভাবে রোগীর বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা যেমন বাতব্যথা, আঘাতজনিত ব্যথা প্যারালাইসিস ইত্যাদি নির্ণয় সহকারে পরিপূর্ণ চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকেন।

যেসব ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপি দরকার হয়

- বাতব্যথা, কোমর ব্যথা, ঘাড় ব্যথা অথবা হাত ব্যথা, হাঁটু অথবা গোড়ালির ব্যথা
- স্পোর্টস ইনজুরি, আঘাতজনিত ব্যথা
- হাড় ক্ষয়জনিত রোগ, জয়েন্ট শক্ত হয়ে যাওয়া
- প্যারালাইসিস জনিত সমস্যায়
- মুখ বেঁকে যাওয়া বা ফেসিয়াল পালসি
- হৃদরোগ অথবা ফুসফুসের বিভিন্ন সমস্যায়
- বিভিন্ন ধরনের অপারেশন পরবর্তী সমস্যায়
- পা বাঁকা (ক্লাব ফুট)
- প্রতিবন্ধী শিশু

বার্ধক্যজনিত সমস্যা ইত্যাদি চিকিৎসার ক্ষেত্রে ও পুনর্বাসন সেবায় ফিজিওথেরাপির ভূমিকা অপরিসীম।

ফিজিওথেরাপির প্রকারভেদ

অর্থো ফিজিওথেরাপি বিভাগঃ এ বিভাগে হাড়, জয়েন্ট ও মাংসপেশির ব্যথাসহ অন্যান্য সমস্যার চিকিৎসা করা হয়।

কার্ডিও রেসপিরেটরি ফিজিওথেরাপিঃ এ বিভাগে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসজনিত সমস্যায় ফিজিওথেরাপি দেয়া হয়। সাধারণত আইসিইউ ও সিসিইউ রোগীদের এ সেবা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

স্পোর্টস ফিজিওথেরাপিঃ স্পোর্টস ইনজুরিতে ফিজিওথেরাপির কোনো বিকল্প নেই। এ বিভাগে ক্রীড়াজনিত আঘাতের পাশাপাশি খেলোয়াড়দের ফিটনেসের সমস্যাগুলোরও সমাধান করা হয়।

গাইনোকলজিক্যাল ফিজিওথেরাপিঃ গর্ভধারণকালীন মাকে সুস্থ সবল শিশুর জন্ম দিতে ও প্রসব পরবর্তী মায়েদের পেটের মাংসপেশি ও মেরুদন্ডের নানা সমস্যায় এ বিভাগে ফিজিওথেরাপি দেয়া হয়।

চাইল্ড ফিজিওথেরাপিঃ এ বিভাগে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের বিকলঙ্গতার চিকিৎসা ও পুনর্বাসন করা হয়।

রিহ্যাবিলিটেটিভ ফিজিওথেরাপিঃ এ বিভাগে শারীরিক প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গদের কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্থাপনসহ রোগীদের পুনর্বাসন করতে নানা ট্রেনিংসহ চিকিৎসা দেয়া হয়।

ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা পদ্ধতি

ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা সাধারণত দুটি ভাগে বিভক্ত

১. ম্যানুয়াল থেরাপি বা মেনুপোলোটিভ ট্রিটমেন্ট

ম্যানুয়াল বা ম্যানুপোলেটিভ থেরাপিতে রোগের প্রকার, ধরণ ও লক্ষণ বুঝে রোগীর আক্রান্ত মাংসপেশি, জয়েন্টের জন্য প্রয়োজনীয় নানা ধরনের ব্যায়াম দেয়া হয়ে থাকে। এছাড়াও রোগীর অবস্থার আলোকে দৈনন্দিন জীবন ব্যবস্থার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রুটিন বেঁধে দেয়া হয়ে থাকে।

২. ইলেক্ট্রোথেরাপি

ইলেক্ট্রোথেরাপিতে চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে রোগীদের সুস্থ করে তোলা হয়। ফিজিওথেরাপির অন্তর্ভুক্ত ইলেক্ট্রোথেরাপি ডিভাইসগুলো হলোঃ

- শর্টওয়েভ ডায়াথার্মি
- মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি
- ইনফ্রারেড রেডিয়েশন
- আলট্রাসাউন্ড থেরাপি
- ট্রান্সকিউটেনিয়াস নার্ভ স্টিমুলেটর
- ইন্টারফেরানসিয়াল কারেন্ট
- কম্পিউটারাইসড অটো ট্রাকশন
- প্যারাফিন ওয়াক্স বাথ
- লেজার থেরাপি
- ইলেক্ট্রনিক ভাইব্রেটর

মাথায় আঘাত (Head Injury)

মাথায় আঘাত একটি জটিল বিষয়। অনেকের এ ব্যাপারে সঠিক ধারণা না থাকায় আরো বেশি জটিলতায় ভোগেন। কেউ যদি মাথায় আঘাত পায় তখন প্রথমেই লক্ষ রাখতে হবে আহত ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস ঠিক আছে কি না। আহত ব্যক্তির শ্বাসনালী পরিষ্কার করার পরও যদি শ্বাস না নেয় তবে আহত ব্যক্তির মুখের সাথে মুখ লাগিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করতে হবে। অজ্ঞান ব্যক্তিকে পুরোপুরি চিত করে শুইয়ে দেওয়া বিপজ্জনক। এ কারণে জিহ্বা পেছনে উল্টে গিয়ে শ্বাসনালি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এ জন্য চামচ জাতীয় কিছু মুখে প্রবেশ করিয়ে রাখলে এ আশঙ্কা কমে যায়। যদি আহত ব্যক্তি বমি করতে থাকে তাহলে শুধু মাথা কাত না করে মাথা, ঘাড় ও দেহ একসাথে কাত করতে হবে। এতে বমি ফুসফুসে প্রবেশ করবে না।

মাথায় অল্প আঘাত লাগলে করণীয়

মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নিতে হবে। মেরুদণ্ডের ক্ষেত্রে ঘাড়ে আঘাত পাওয়া ব্যক্তির মৃত্যুর ঝুঁকি অনেক বেশি। মাথার নিচে বালিশ ব্যবহার করা উচিত নয়। মাথা সামনের দিকে না ঝুঁকে পেছনের দিকে ঝুঁকে থাকা নিরাপদ। সেজন্য একটা তোয়ালে বা গামছা গোল করে পেচিয়ে ঘাড়ের নিচে দেওয়া সুবিধাজনক, যেন ঘাড় পেছনের দিকে ঝুঁকে থাকে। তবে মাথার নিচে অবশ্যই কোনো কিছু দেয়া উচিত নয়। মেরুদণ্ডে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বিশেষ করে খেয়াল রাখতে হবে মাথা ও ঘাড়ের দিকে। ঘাড়ের দু পাশে দুটি হাত দিয়ে স্থির করে নিতে হবে।

প্রথমে মাথার আশেপাশে যেসব জিনিস লেগে আছে সেগুলোকে সরিয়ে ফেলতে হবে। কিন্তু যদি কিছু মাথায় ঢুকে গিয়ে থাকে সেটা কোনো মতেই টেনে বার করা উচিত নয়। এছাড়া ক্ষতের উপরে যদি কিছু আটকে থাকে, তাহলে তার উপর চাপ না দিয়ে তার চারিদিকে চাপ দিয়ে ধরে থাকতে হবে।

মাথার আঘাতে যদি রক্তক্ষরণ হয়, তবে তা বন্ধ করার জন্য কাপড় দিয়ে চাপ দিয়ে ধরে রাখতে হবে। রক্ত বন্ধ করতে প্রায় দশ মিনিট ক্ষতস্থানে চাপ দিয়ে রাখাটা প্রয়োজন। দশ মিনিটের আগে অল্পক্ষণের জন্যেও চাপ সরালে কাজ হবে না। রক্তে যদি কাপড় ভিজে যায়, তবে সেটাকে না সরিয়ে তার ওপর আরেকটা কাপড় চাপিয়ে চেপে ধরে থাকতে হবে। ১০ মিনিট চেপে ধরে থাকতে হবে। এই ভাবে তিনবার অর্থাৎ ৩০ মিনিট চাপ দিয়ে ধরে রাখতে হবে।

মাথায় গুরুতর আঘাত লাগলে করণীয়

মাথার চোট গুরুতর হলে সেটা মস্তিস্ক এর ক্ষতি করতে পারে। মাথায় যত জোরে আঘাত লাগবে, মস্তিস্কের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ততোই বেশী থাকবে। মস্তিস্কের কোনো ক্ষতি হয়েছে কিনা সেটা সহজে বোঝা যায় না। তবে মাথার চোট যদি খুব বেশী হয় তাহলে তার বাহ্যিক লক্ষণগুলি হলঃ

- স্মরণশক্তি নষ্ট হয়ে যায়
- ভীষণ মাথা ব্যথা হয় যা একটু একটু করে বাড়তে পারে
- অনেকে মাথায় গুরুতর আঘাতে খালি ঘুমিয়ে পড়তে চাইবে, জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে
- চোখের মনির অস্বাভাবিকতা দেখা যায়
- চোখের চারপাশ কালচে হয়ে যায়
- নাক, মুখ ও কান দিয়ে তরল পদার্থ বা রক্ত নির্গত হয়
- অস্থিরতা বা অস্বাভাবিক আচরণ করতে দেখা যায়
- বার বার বমি করে
- শ্বাস প্রশ্বাস কমে যায়
- খিঁচুনি হতে পারে
- ঘাড় শক্ত হয়ে যায়
- কথা বলতে সমস্যা হয়

মাথার আঘাতে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হলে

যদি রোগীর প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়, তখন রোগী শক এ চলে যেতে পারে। কিছু কিছু লক্ষণ দেখে রোগী শক এ গিয়েছে কিনা তা নির্ণয় করা যায়। যেমনঃ

- শরীর ঠাণ্ডা ও ঘর্মাক্ত হয়ে ফ্যাকাসে হয়ে যায়
- শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হয়
- কথার উত্তর দিতে পারে না
- স্পর্শ করলে সাড়া দিতে পারে না

বাচ্চাদের মাথায় আঘাত লাগলে করণীয়

অনেক সময়ে বাহ্যিক লক্ষণ ছাড়াও বাচ্চাদের মাথায় চোট লাগতে পারে অথবা মস্তিস্কের ভিতর রক্তক্ষরণ হতে পারে। বাইরে থেকে এই রক্তক্ষরণ দেখা না গেলেও এই রক্ত মস্তিস্কে চাপের সৃষ্টি করে এবং মস্তিস্কের স্থায়ী ক্ষতি ঘটাতে পারে। মাথায় চোট লাগার পর সেটা মস্তিস্কের জন্য ক্ষতিকারক কিনা বোঝার জন্য অন্তত ২৪ ঘন্টা তাকে পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখা ভালো।

বাড়িতে যাদের ছোট বাচ্চা আছে তাদের জন্য বাড়িকে নিরাপদ রাখা বিশেষ জরুরী। যেমনঃ

- যেখানে হঠাৎ উঁচুনিচু আছে সেখানে বাচ্চাদের খেলতে না দেওয়া
- বাড়ির আসবাবপত্র এবং ইলেকট্রিকের তার ইত্যাদি এমন ভাবে রাখতে হবে যাতে বাচ্চারা তার থেকে আঘাত না পায়

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

রোগ ও জিজ্ঞাসা

প্রশ্নঃ পাতলা বা হালকা গড়নের মানুষের রক্তেও কি কোলেস্টেরল আধিক্য থাকতে পারে?

উত্তরঃ অনেকেই মনে করেন হালকা বা পাতলা গড়নের মানুষের শরীরে অতিরিক্ত ক্ষতিকর কোলেস্টেরল বা চর্বি থাকার সম্ভাবনা নেই। কথাটি মোটেও ঠিক নয়। যেকোনো গড়নের শরীরেই অতিরিক্ত ক্ষতিকর চর্বি জমা হয়ে থাকতে পারে। তবে স্থূল বা অতিরিক্ত ওজনের মানুষের এই ঝুঁকি বেশি। এ ছাড়া রক্তে চর্বি জমার পারিবারিক ইতিহাসও গুরুত্বপূর্ণ। হালকা পাতলা বা মোটা সবারই এই সমস্যা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে ও নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে।

প্রশঃ ছোটবেলায় মাছ কম খাওয়ার কারণে কি বড় হলে গলগণ্ড হয়?

উত্তরঃ কথাটা আংশিক সত্য। উঁচু পার্বত্য এলাকা ও বন্যাবিধৌত এলাকার (যেমন বাংলাদেশের) মাটিতে আয়োডিনের পরিমাণ কম থাকে। তাই এসব এলাকার শাক সবজিতে আয়োডিনের মাত্রা থাকে কম। আর আয়োডিনের অভাবে অনেক সময় গলগণ্ড হতে দেখা যায়। যেহেতু সামুদ্রিক মাছে প্রচুর আয়োডিন আছে, সেহেতু শিশুদের গলগণ্ড প্রতিরোধে একসময় অনেক মাছ খেতে বলা হতো। কিন্তু বর্তমানে বাজারের বেশির ভাগ লবণই আয়োডিনযুক্ত। খাবারে আয়োডিনের অভাব হওয়ার কথা নয়। বরং অতিরিক্ত ও অধিক মাত্রার আয়োডিনযুক্ত খাবারও নতুন করে নানা সমস্যার সৃষ্টি করছে ।

প্রশ্নঃ বেশি বেশি চোখের কাজের (যেমনঃ পড়াশোনা) সঙ্গে দৃষ্টিশক্তি হ্রাসের কোনো সম্পর্ক আছে কি?

উত্তরঃ দৃষ্টিশক্তি ঠিক থাকলে পড়াশোনার সঙ্গে চোখ খারাপ হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে কারও মাইনাস পাওয়ার বা প্লাস পাওয়ার থাকলে পড়াশোনা বা কম্পিউটারে অতিরিক্ত সময় ধরে কাজ করলে চোখে ব্যথা, মাথাব্যথা, ক্লান্তিবোধ ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এসব ক্ষেত্রে চোখের পাওয়ার পরীক্ষা করে চশমা ব্যবহার করে সমস্যামুক্ত থাকা সম্ভব।

প্রশ্নঃ লেজার চিকিৎসার মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তির সমস্যা বা চশমার প্রয়োজনীয়তা পুরোপুরি দূর করা কি সম্ভব?

উত্তরঃ চোখের কর্নিয়া স্বাভাবিক থাকলে ২০ বছর বয়সের পর লেজারের মাধ্যমে ১২ থেকে ১৪ ডায়াপটার পর্যন্ত প্লাস বা মাইনাস পাওয়ারকে শূন্য পাওয়ার করা সম্ভব। তবে যাদের চশমার পাওয়ার এর চেয়ে বেশি, তাদের পাওয়ার লেজারের সাহায্যে চশমার পাওয়ার কিছুটা কমানো যায়। কিন্তু পুরোপুরি শূন্য করা যায় না।

প্রশ্নঃ উচ্চ রক্তচাপের রোগী ও হৃদরাগীরা কি দুধ খেতে পারবেন?

উত্তরঃ উচ্চ রক্তচাপ বা হৃদরাগের জন্য দুধ খেতে কোনো মানা নেই। দুধে যেটুকু চর্বি আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি আছে উপকারী উপাদান, যেমন আমিষ, ক্যালসিয়াম ও অন্যান্য ভিটামিন ও খনিজ। দুধ খাওয়া বন্ধ না করে বরং এড়িয়ে চলা উচিৎ উচ্চ ক্যালরিযুক্ত ও ট্রান্স ফ্যাটসমৃদ্ধ খাবার, যেমন কেক, পেস্ট্রি, বেকিং করা খাবার ও নানা ধরনের ফাস্টফুড। প্রতিদিন এক কাপ দুধ খেলে এমন কোনো ক্ষতি নেই।

প্রশ্নঃ কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য দীর্ঘদিন ল্যাকটুলোজ জাতীয় ওষুধ খাওয়া কি ক্ষতিকর?

উত্তরঃ কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য অনেকেই দিনের পর দিন ল্যাকটুলোজ জাতীয় সিরাপ সেবন করে থাকেন। এর ফলে একধরনের বদভ্যাস তৈরি হয়। তখন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় মলত্যাগে সমস্যা হতে পারে। এ ছাড়া দীর্ঘদিন এসব ওষুধ খেলে মল নরম হয় ও কিছু পুষ্টি উপাদানেরও অভাব দেখা দিতে পারে। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার জন্য দৈনন্দিন খাবারের সঙ্গে প্রচুর শাকসবজি, আঁশযুক্ত খাবার, নিয়মিত প্রচুর পানি পান করার পাশাপাশি ইসবগুলের ভুসি, বেলের শরবত, পেঁপে ইত্যাদি খেয়ে ভালো থাকার চেষ্টা করা যায়। তার পরও সমস্যা হলে চিকিৎসকের পরামর্শে মাঝেমধ্যে ওষুধ খাওয়া যেতে পারে।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

খোসপাঁচড়া (Scabies)

খোসপাঁচড়া এক ধরনের ছোঁয়াচে বা সংক্রামক রোগ । Sarcoptes Scabiei নামক এক ধরনের পরজীবী দ্বারা এই রোগ হয়ে থাকে। এটি আমাদের দেশে খুব বেশি দেখা যায়। বাড়িতে অন্য সদস্যদের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে।

শরীরের কোথায় হয়

আঙ্গুলের ফাঁকে, হাতের তালুর প্রান্তে, কব্জির সামনে, কনুই, বোগলের সামনে ও পেছনের ভাঁজে, উরুর ভেতর দিকে, নাভীর চারপাশে, বেল্ট লাইন বরাবর, নিতম্ব ইত্যাদি স্থানে সাধারণত এই রোগ হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে মুখে হতে পারে ।

উপসর্গ ও লক্ষণ

- ছোট ছোট দানার মতো উঠে, যা প্রচণ্ড চুলকায়, বিশেষ করে রাতের বেলায়
- প্রথম দিকে চুলকালে একটু আরাম বোধ হলেও, পরে জ্বলতে থাকে
- দানার মধ্যে মাঝে মাঝে পানি ও পুঁজ দেখা যায়

কিভাবে ছড়ায়

- অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্নতা এই রোগ বিস্তারের অন্যতম কারণ
- রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সাথে মেলামেশা করলে, তার পোশাক পরলে, তার বিছানায় শুলে, ব্যক্তিগত জিনিসপত্র (যেমনঃ গামছা, তোয়ালে ইত্যাদি) ব্যবহার করলে
- যৌন সংস্পর্শসহ যেকোনো প্রকার সংস্পর্শ থেকে হতে পারে
- ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের ও বাচ্চাদের মধ্যে এই রোগ বেশি দেখা দেয়

চিকিৎসা

- পারমেথ্রিন (Permethrin) ক্রিম পুরো শরীরে (মুখ ব্যতীত) ভালভাবে লাগিয়ে ৮-২৪ ঘণ্টা পর ধুয়ে ফেলতে হবে। ১ সপ্তাহ পর একই ভাবে আরো একবার ঔষধ লাগাতে হবে
- চুলকানি কমানোর জন্য এন্টিহিস্টামিন দেয়া যেতে পারে
- রোগীর ব্যবহৃত কাপড়, বিছানার চাদর ও বালিশের কভার গরম পানিতে সিদ্ধ করে ধুতে হবে
- আক্রান্ত ব্যক্তিসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও একই সাথে চিকিৎসা নেয়া ভালো
- এর পরেও রোগ ভালো না হলে রোগীকে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে

জটিলতা

- অন্যান্য চর্মরোগ হতে পারে
- শিশুদের কিডনি রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়

শিশুর জ্বর

জ্বর কোন রোগ নয়, এটি শরীরে রোগ বা অসুস্থ অবস্থার একটি লক্ষণ মাত্র। আমাদের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৮ ডিগ্রী ফারেনহাইট। তাই তাপমাত্রা ১০৪ - ১০৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠে গেলে শীত অনুভব হয়। এটাই জ্বর। জ্বর একটা উপসর্গ, এটা নিজে কোন রোগ নয়। জ্বর হলো একটা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যা শিশুকে সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহায্য করে। কিন্তু তা যদি ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়ার কারণে হয়, তখন তা ভয়ের কারণ হতে পারে। শরীরের তাপমাত্রা ১০৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট বা তারও উপরে উঠে গেলে, তা মস্তিষ্কের কোন কোন অংশকে স্থায়ীভাবে নষ্ট করে দিতে পারে বা এমন কি রোগীর মৃত্যুর কারণও হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে এই আশংকা বড়দের চেয়ে অনেক বেশী, কারণ শিশুরা তাদের অসুস্থতার কথা প্রকাশ করতে পারে না এবং শিশুর মস্তিষ্ক তুলনামূলক ভাবে বেশী নরম ও সেনসেটিভ থাকে। কখনোই শরীরের তাপমাত্রা বেশী বাড়তে দেয়া উচিত নয়। বিশেষ করে ১০২ - ১০৩ ডিগ্রী ফারেনহাইটের বেশী উঠতে দেওয়া যাবে না। শিশুর যদি শীত লাগে, শীতে শিশু কুঁকড়ে যায় বা কাঁপতে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে তার জ্বর আরো বাড়ছে। এই অবস্থায়, পরিষ্কার সুতি পাতলা কাপড়

স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানিতে ভিজিয়ে শিশুর মাথা, কপাল, মুখ এবং হাত পায়ের পাতা ভালো করে বার বার মুছে দিতে হবে। এরপরও তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে শিশুর মাথা স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানি দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে, যেন মাথার তাপমাত্রা বেশী না বাড়ে। শিশুর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসলেই শিশুকে মোটা লেপ বা কম্বল দিয়ে জড়িয়ে রাখা ঠিক না। শিশুর আরামের জন্য হালকা কাঁথা বা কম্বল দিয়ে তাকে জড়িয়ে রাখা যেতে পারে। মোটা লেপ অথবা কম্বল দিয়ে শিশুকে জড়িয়ে রাখলে শিশুর শরীরের তাপ বাইরে বের হতে পারে না, ফলে ক্ষতির ঝুঁকি বেড়ে যায়। শিশুর শরীরের কোন অংশের প্যারালাইসিস না হলেও মস্তিষ্কের অনেক অংশের ক্ষতি হতে পারে, যা তাৎক্ষণিক ভাবে হয়তো বোঝা যায় না। তবে শিশু বড় হওয়ার সাথে সাথে তা বোঝা যায় যেমন- শিশুর বুদ্ধিমত্তা, স্মৃতিশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ইত্যাদি কমে যাওয়া। কাজেই শিশুর জ্বর হলে বিষয়টিকে হালকা ভাবে না নিয়ে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিৎ।

কিভাবে জ্বর কমানো যায়

স্পঞ্জ বাথ করাতে হবে

শিশুকে স্বাভাবিক পানি দিয়ে ১৫ থেকে ২০ মিনিট স্পঞ্জ বাথ করাতে হবে। পানি শরীর থেকে বাষ্পীভূত হয়ে যাবার সময় শরীরকে ঠাণ্ডা রাখে যার ফলে জ্বর কমে যায়। কখনও বেশি ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ এতে শিশুর কাপুনি ওঠে। কাপুনি প্রকৃত পক্ষে শরীরের তাপমাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয় যার ফলে স্পঞ্জ বাথের পুরো উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যায়।

শিশুকে প্রচুর পরিমাণ তরল খাওয়াতে হবে

জ্বর হলে শিশু স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়, ফলে তার শরীর থেকে অতিরিক্ত তরল বের হয়। যদি তার ডায়রিয়া থাকে তাহলে আরও বেশি তরল বের হয়। এই সময়ে নিশ্চিত করতে হবে যে, শিশু যেন বেশী বেশী তরল পান করে (একবারে বেশী পানি পান না করে অল্প করে বার বার পান করাতে হবে)। পাশাপাশি শিশুর খাবারে কিছুটা বৈচিত্র্য আনা যেতে পারে যেমন স্বাভাবিক খাবারের পাশাপাশি শিশুকে স্যুপ, জাউ ও হালুয়া দেয়া যেতে পারে। যেসব শিশু বুকের দুধ খায়, তাদের নিয়মিত বুকের দুধ খাওয়াতে হবে, এতে শরীরে তরলের অভাব পূরণ হয়। যদি শিশুর জ্বরের সাথে ২৪ ঘণ্টার বেশি ডায়রিয়া থাকে তাহলে অবশ্যই শিশুকে ঘন ঘন খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে।

শিশুকে পছন্দ মত খাবার দিতে হবে

জ্বর হলে শিশুরা খেতে চায়না। যদি শিশু জ্বরের সময় খেতে না চায়, তাকে খাবার জন্য বেশি জোরাজুরি না করাই ভালো। যদি শিশু নির্দিষ্ট কোন খাবার খেতে চায়, তবে তাকে সেই খাবার খেতে দেওয়া ভালো।

শিশুকে হালকা পোশাক পরাতে হবে

শিশুকে লেপ, তোষক ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে রাখলে শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত বেড়ে যাবে, এর ফলে জ্বরের অবনতি ঘটবে। তাই আপনার শিশুকে হালকা পোশাক পরাতে হবে এবং ঘুমানোর সময় একটা পাতলা কম্বল বা চাদর দিয়ে শরীর ঢেকে দিতে হবে।

শিশুকে ঘরে রাখতে হবে

শিশুর যত দিন জ্বর থাকে, তখন তাকে বাইরে বেড়াতে না দিয়ে ঘরে রাখা সবচেয়ে ভাল। শিশুর তাপমাত্রা স্বাভাবিক হবার ২৪ ঘণ্টা পর তাকে স্কুলে পাঠানো যেতে পারে। তবে অনেক ক্ষেত্রে জ্বর চলে যাবার পরও সংক্রমণের ঝুঁকি থেকে যায়। তাই শিশুর জ্বর ভালো হওয়ার পরও বাসায় রাখা ভালো।

শিশুর জ্বর ও খিঁচুনি

অতিমাত্রায় জ্বরে ভুগছে এমন শিশুদের জ্বরজনিত খিঁচুনি সাধারণত দেখা যায়। যে শিশু কানের প্রদাহ, সংক্রমণ, ঠাণ্ডা, সর্দি, ইত্যাদিতে বেশি মাত্রায় ভুগে থাকে, সে শিশু জ্বরজনিত খিঁচুনিতে আক্রান্ত হয়। কিছু মারাত্মক সংক্রমণও এ খিঁচুনির কারণ হতে পারে, যেমন নিউমোনিয়া, মেনিনজাইটিস ইত্যাদি। এ ধরনের খিঁচুনির ক্ষেত্রে কারণ শনাক্ত করে যদি চিকিৎসা সেবা দেয়া যায়, তবে কোনো রকম স্থায়ী ক্ষতি ছাড়াই শিশুকে সুস্থ করা যায়।

জ্বরজনিত খিঁচুনি কেন ও কাদের হয়

শরীরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয় এমন যে কোনো অসুখই এ ধরনের খিঁচুনির জন্য দায়ী। এটি কোনো অসুখ নয়, অন্য কোনো অসুখের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কতগুলো রোগ আছে যেগুলো খিঁচুনির কারণ হিসেবে চিহ্নিত। যেমন-

- কানে প্রদাহ এবং সংক্রমণ
- সর্দি, কাশি ও ঠাণ্ডা লাগা
- ইনফ্লুয়েঞ্জা
- নিউমোনিয়া
- মেনিনজাইটিস
- কিডনির সংক্রমণ

সাধারণত ছয় বছর বয়সের আগে শতকরা ৩ জন শিশু এ ধরনের খিঁচুনিতে ভুগে থাকে। তবে, খিঁচুনি বেশি হতে দেখা যায় ১৮ মাস থেকে ৩ বছর বয়সের মধ্যে। সাধারণত ৬ মাস বয়সের নিচে এবং ৬ বছরের পর জ্বরজনিত খিঁচুনি কম হতে দেখা যায়।

জ্বরজনিত খিঁচুনির প্রকারভেদ

জ্বরজনিত খিঁচুনি সাধারনত ৩ ধরনের হতে পারে।

- সাধারণ খিঁচুনি
- অল্প জটিল ধরণের খিঁচুনি
- জটিল ধরণের খিঁচুনি

নিম্নে এ তিন ধরণের খিঁচুনি সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

সাধারণ খিঁচুনি (২০ জন আক্রান্ত শিশুর মধ্যে ১৫ জনের ক্ষেত্রে)

এই ধরনের খিঁচুনিই সবচেয়ে বেশি ঘটে থাকে। শিশুর শরীর এতে লালচে রঙ ধারণ করতে পারে, শরীর শক্ত হয়ে যেতে পারে এবং শরীর আঁকাবাঁকা আকার ধারণ করতে পারে। তবে, এই অবস্থা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। কয়েক সেকেন্ড থেকে শুরু করে ৫ মিনিটের বেশি স্থায়ী হয় না। শিশু কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে যেতে পারে। জ্বর কমে গেলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শিশু সুস্থ বোধ করতে শুরু করে। এ খিঁচুনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বারবার ফিরে আসে না।

অল্প জটিল ধরনের খিঁচুনি (২০ জন শিশুর মধ্যে ৪ জনের ক্ষেত্রে)

এটিও সাধারণ খিঁচুনির মতো। তবে, এতে আরও কিছু উপসর্গ দেখা যেতে পারে, যেমন ঃ

- খিঁচুনির স্থায়িত্ব ১৫ মিনিট কিংবা তার চেয়েও বেশি হতে পারে
- ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একাধিকবার ঘটতে পারে
- সারা শরীরে খিঁচুনি দেখা দিতে পারে
- আংশিক খিঁচুনিও হতে পারে, যেমন শুধু এক পা কিংবা এক হাত

জটিল ধরনের খিঁচুনি (২০ জন শিশুর মধ্যে ১ জনের ক্ষেত্রে)

এক্ষেত্রে খিঁচুনি সময়সীমা বেড়ে ৩০ মিনিট পর্যন্ত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে যা করা যেতে পারে তা হল ঃ

- কখন খিঁচুনি শুরু হল তা খেয়াল করতে হবে
- মাথার দিকটা নিচু রেখে শিশুকে শুইয়ে দিতে হবে
- মুখে কোনো খাবার দেয়া যাবে না
- খিঁচুনির সময় শিশুকে ঝাঁকানো যাবে না এবং শিশুকে বাঁকা করা যাবে না
- খিঁচুনির সময় শিশুর মাথায় পানি ঢেলে এবং নরম সুতি কাপড় ভিজিয়ে গা মুছে দেয়া উচিত এবং তাকে ঢিলেঢালা কাপড় পরানো উচিত।

প্রাথমিক চিকিৎসার পর কী করণীয়

শিশুকে ভালোমতো পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং নিচের উপসর্গগুলো দেখা দিলে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে :

- একবার খিঁচুনির পর শিশুর অবস্থার উন্নতি না হলে
- একবার খিঁচুনির পর যদি আবারও তা হতে থাকে
- শিশুর যদি শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়

জ্বরজনিত খিঁচুনির চিকিৎসা

খিঁচুনি যদি নিজে থেকেই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ভালো হয়ে যায়, তবে কোনো চিকিৎসার দরকার হয় না। তা না হলে :

- শিশুর গায়ের কাপড় আলগা করে দিতে হবে। ঘর গরম থাকলে শিশুর গায়ের সব কাপড় খুলে দেয়া যেতে পারে
- প্যারাসিটামল Suppository বা বড়ি দিতে হবে
- ডায়াজেপাম সিরাপ বা বড়ি দিতে হবে
- ঠাণ্ডা পানীয় পান করাতে হবে
- জ্বরের আসল কারণ বের করে মূল রোগের চিকিৎসা করাতে হবে

জ্বরজনিত খিঁচুনি কি বারবার ঘটতে পারে

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি একবারই ঘটে থাকে। তবে, প্রতি ১০ জন শিশুর মধ্যে অন্তত ৩ জনের ক্ষেত্রে জ্বরের সময় আবারও এটি হতে পারে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, জ্বরজনিত খিঁচুনি হয়েছিল এমন ১০ জন শিশুর ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে প্রচণ্ড জ্বরের সময় তাদের আবারও দুই থেকে তিনবার খিঁচুনি হয়েছিল। এই খিঁচুনিতে পারিবারিক ইতিহাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কোনো স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে কি

সাধারণত এ রোগে কোনো স্থায়ী ক্ষতি হয় না। রোগ পরবর্তী কোনো ক্ষতি ছাড়া পুরোপুরি ভালো হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে যে অসুখের কারণে খিঁচুনি হচ্ছে তার মাধ্যমে ক্ষতি হতে পারে। সেজন্য, যে কারণে জ্বর হচ্ছে তার চিকিৎসা করা জরুরি।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

ইনফো কুইজ

ইনফো কুইজের সকল প্রশ্নগুলো বিশেষ প্রবন্ধ "ধনুষ্টংকার" থেকে নেয়া হয়েছে। আশা করি আপনারা বিশেষ প্রবন্ধটি ভালভাবে পড়ে সঠিক উত্তরে (✓) টিক চিহ্ন দিয়ে ইনফো মেডিকাসের সাথে সংযুক্ত বিজনেস রিপ্লাই কার্ডটি আগামী ১৭ আগষ্ট ২০১৫ ইং তারিখের মধ্যে আমাদের বিক্রয় প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করবেন।

১. আমাদের দেশে প্রতিবছর গড়ে কত লোক ধনুষ্টংকার রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়?

ক) ৫ থেকে ১০ হাজার
খ) ১০ থেকে ১৫ হাজার
গ) ১৫ থেকে ২০ হাজার
ঘ) ২০ থেকে ২৫ হাজার

২. কোন জীবাণু দিয়ে ধনুষ্টংকার রোগ হয়?

ক) *Corynebacterium diptheriae*
খ) *Clostridium tetani*
গ) *Escherichia coli*
ঘ) *Haemophillus influenza*

৩. নিচের কোনটি ধনুষ্টংকার রোগের কারণ নয়?

ক) জুতার ছিদ্র দিয়ে পেরেক ঢুকে পা কেটে গেলে
খ) শিশুর নাড়ি কাটার সময় পুরাতন ব্লেড ব্যবহার করলে
গ) পা মচকালে
ঘ) অনেক সময় সন্তান গর্ভপাত হওয়ার ফলে মা ধনুষ্টংকার রোগে আক্রান্ত হয়

৪. ক্লষ্ট্রিডিয়াম টিটানী *(Clostridium tetani)* জীবাণুটির সুপ্তকাল কত দিন?

ক) ১ থেকে ১০ দিন
খ) ১০ থেকে ১৫ দিন
গ) ৭ থেকে ২০ দিন
ঘ) ৩ থেকে ২১ দিন

৫. নিচের কোনটি ধনুষ্টংকার রোগের লক্ষণ নয়?

ক) সর্দি লাগা
খ) খিঁচুনি হওয়া
গ) ঢোক গিলতে কষ্ট হওয়া
ঘ) রোগীর ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া

৬. ধনুষ্টংকার চিকিৎসা করা না হলে ধনুষ্টংকার রোগী কিভাবে মারা যায়?

ক) স্ট্রোক করে
খ) খেতে না পেরে
গ) শ্বাস নিতে না পেরে
ঘ) উপরের কোনটিই নয়

৭. ধনুষ্টংকার রোগ প্রতিরোধ করার জন্য, টিটেনাস টক্সোয়েডের বুস্টার ডোজ কয় বছর পর পর দিতে হবে?

ক) ১ বছর
খ) ২ বছর
গ) ৫ বছর
ঘ) ১০ বছর

৮. শিশুদের ধনুষ্টংকার রোগের টিকার নাম কি?

ক) পেন্টাভ্যালেন্ট
খ) ওপিভি
গ) এমআর
ঘ) বিসিজি

৯. শিশুদের ধনুষ্টংকার রোগের টিকার ডোজ কয়টি?

ক) ১ টি
খ) ২ টি
গ) ৩ টি
ঘ) ৪ টি

১০. প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলাদের ক্ষেত্রে ধনুষ্টংকার রোগের টিকাটি শরীরের কোথায় দেয়া হয়?

ক) উরুর মাংসপেশিতে
খ) বাহুর মাংসপেশিতে
গ) মুখে খাওয়ানো হয়
ঘ) বাহুর চামড়ার নিচে

তরমুজের ১০ টি পুষ্টিগুণ

১

কিডনির জন্য বেশ উপকারি ফল তরমুজ। ডাবের পানির যে গুণাগুণ, তরমুজেও রয়েছে সেই গুণাগুণ। কিডনি ও মুত্রথলিকে বর্জ্যমুক্ত করে ফলটি। কিডনিতে পাথর হলে, চিকিৎসকরা ডাবের পানি, তরমুজ খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

২

তরমুজ হার্টের জন্য ভালো। রক্তবাহী ধমনীকে নমনীয় ও শীতল রাখে এটি। স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধে বেশ কার্যকর ভূমিকা রাখে এ ফলটি।

৩

রোগাক্রান্ত কোন ব্যক্তিকে দ্রুত সারিয়ে তুলতে ভূমিকা রাখে তরমুজ।

৪

তরমুজে আছে ভিটামিন সি, যা ত্বককে সজীব রাখার পাশাপাশি ত্বকের যে কোন সমস্যা প্রতিরোধ করে।

৫

ভাইরাসজনিত সংক্রমণ বা চোখের দৃষ্টিশক্তির সমস্যা প্রতিরোধ করে এ ফলটি।

৬

পানিশূন্যতা জাতীয় সমস্যা প্রতিরোধ করে তরমুজ।

৭

তরমুজ রক্তচাপ কমায় ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। তরমুজে পটাসিশয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম থাকায়, তা রক্তচাপ কমায়।

৮

ভিটামিন এ এবং সি এর চাহিদা পূরণ করে এ ফলটি। ১০০ গ্রাম তরমুজ শরীরের ভিটামিন এ এর মোট চাহিদার ১১ শতাংশ পূরণ করে। আর মাত্র এক টুকরো তরমুজ প্রতিদিনের ভিটামিন সি এর চাহিদার প্রায় অর্ধেক পূরণ করে।

৯

লাইকোপিনসহ বিভিন্ন উপাদানে সমৃদ্ধ তরমুজ খাওয়ার অভ্যাসে বার্ধক্য দেরিতে আসে। ত্বকে সহজে ভাঁজ বা বলিরেখা পড়ে না।

১০

তরমুজে আছে ভিটামিন বি২, বি৬, বি১২ (ফলেট) যা শরীরে শক্তি যোগায় এবং রক্ত উৎপাদনে ভূমিকা রাখে।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

ACI

ADVANCING
POSSIBILITIES